The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 67 - 76)
Published in November 2024

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনা

ড. শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ*

প্রতিপাদ্যসার: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক গল্পে শক্তি ধর্মাচরণ বা কালীসাধনা তথা তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কালী বাঙালির শক্তি সাধনার অন্যতম দেবী। এই দেবী ভয়ঙ্করী, শ্যামবর্ণা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, বামের দুহাতে একটিতে সদ্যছিন্ন শির, ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ, ডানে নিচের হাতে অভয়, ঊর্ধ্বের বর। শবারূঢ়া তিনি। শিবাকুল দ্বারা সমন্বিতা। 'কালকে গ্রাস করেন বলেই দেবী কালী।' তিনি আদিভূতা, আদ্যাকালী, বাঙালির শক্তি সাধনার কেন্দ্রে এই কালী দেবী, তারাকেও কালীস্থানীয়া করে নেওয়া হয়েছে। তিনি ''খড়্গ'', ''ট্যারা'', ''ছলনাময়ী'', ''পুত্রেষ্টি'', ''প্রতিধ্বনি'', ''চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস'', ''রায়বাড়ি'', ''ট্রিটি'', ''ডাইনী'', ''একরাত্রি'', ''প্রহ্লাদের কালী'', ''সখী ঠাকরুন'' প্রভৃতি গল্পে কখনো শক্তিপূজক হিসেবে, কখনো বা তন্ত্রসাধনার প্রত্যক্ষ বাতাবরণে ধর্মাচার রূপায়িত করেছেন। ধর্মাচার ও ধর্ম বিশ্বাসের বিচিত্র পরিচয় লেখক মানুষের জীবনযাপনে, পেশায় ও চেতনায় রূপান্বিত করেছেন। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে তন্ত্র ও তান্ত্রিক বিষয় সম্বলিত তারাশঙ্করের গল্পগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে বিস্তৃত পরিসরে তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন (দাশগুপ্ত ৬৩-৭৯)। অন্যদিকে মিল্টন বিশ্বাস তাঁর 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ' গ্রন্থে উক্ত বিষয়ের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন (বিশ্বাস ৩২৮-৪৪৮)। বাংলায় কালী নানা প্রকারের, কালীর সাধনার পদ্ধতিও বিবিধ। কালীপূজা বা শ্যামাপূজা দীপালি উৎসবের দিনে প্রধানত করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোনো উপলক্ষে 'মানসিক' করা কালীপূজার ব্যবস্থা হয়। কালীসাধনাকে কেন্দ্র করে তান্ত্রিক সাধনা তথা শক্তি সাধকদের আবির্ভাব। 'পার্বতী উমা সতী এবং দুর্গা চণ্ডিকার ধারা মিলিয়া পুরাণ-তন্ত্রাদিতে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই, তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে আর একটা ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীর ধারা। এই কালী বা কালিকাই বাঙলাদেশের শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া উঠিয়া দেবীর অন্য সব রূপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন (দাশগুপ্ত ৬৩)।'

লোক আচরিত বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রদায় যেমন তারাশঙ্করের গল্পে শিল্পরূপ পেয়েছে তেমনি শাক্ত ও তান্ত্রিক ধর্ম চর্চার তথা শক্তি উপাসকদের জীবনকে রূপায়িত করেছেন তিনি। বীরভূম শাক্ত ধর্ম চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। তারাশঙ্করের পরিবার ছিল তন্ত্রোপাসক। *ধাত্রীদেবতায়* শিবনাথ বলেছেন– আমাদের দেশটাই হল তান্ত্রিকের দেশ। এককালে তন্ত্রসাধনার মহাসমারোহ ছিল আমাদের দেশে (দেবতা ১৩)। বীরভূমের কঙ্কালীতলা, তারাপীঠ, উদ্ধারণপুর বক্রেশ্বর লাভপুর, সাঁইথিয়া প্রভৃতি স্থান শাক্তপীঠ হিসেবে পরিচিত। বক্রেশ্বর তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম পীঠস্থান। লাভপুরে দেবী ফুলরার মন্দির বিখ্যাত। এছাড়া 'এখানে গ্রামে গ্রামে, বিশেষত লাভপুর, কীর্ণাহার অঞ্চলে বহু প্রসিদ্ধ কালীবিগ্রহ পূজিত হয়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিভিন্ন শাক্তবিগ্রহের নাম ও

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জনপ্রিয়তার উল্লেখ আছে। যেমন, ভাঙাকালী, জয়ন্তীমঙ্গলা কালী, বুড়ী কালী, শ্মশানেশ্বরী, বাকুলের মা শ্মশানকালী প্রমুখ। শক্তিপূজার সঙ্গে এদিকে তন্ত্রসাধনাও অধিক প্রচলিত (মুখোপাধ্যায় ৩২২)।

- তারাশঙ্করের গল্পে শাক্ত সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গল্পটিতে পাওয়া যায় কালীভক্তের পূজা প্রক্রিয়াও। তবে লেখক 'তন্ত্রোপাসক পরিবারের সন্তান হয়েও তন্ত্রসাধনার নির্মমতা, কদাচার আর ব্যভিচার' ও তার অন্তঃসারশূন্য ভণ্ডামিকে তুলে ধরেছেন (গিরি ৭৫২)। তারাশঙ্করের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করতে দেখা গেছে। সেই অভিজ্ঞতায় নিম্নবর্গের মানুষের রাজত্ব মহিমান্বিত। তাছাড়া পারিবারিক ঐতিহ্যে তান্ত্রিকতার প্রভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই বলা হয়- 'তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারাশঙ্করের একাধিক ছোটগল্পের বিষয়ীভূত হয়েছে (ভট্টাচার্য ৫৮)।' গল্পগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।
- ''খড়্গ'' গল্পে পিতৃনির্দেশে বংশের বৃত্তিরক্ষায় ব্রতী কিন্তু জীব হত্যায় অনিচ্ছুক ছেত্তা কামারের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। রামজীবনের সিংহবাহিনীর মন্দিরের বলির বংশানুক্রমিক ছেত্তা ব্রহ্মচর্য পালন করে, অবলীলায় বড় বড় মহিষ বলি দেয়। মন্দিরের পুরোহিত মহাতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে দশ সের ওজনের খড়্গ কালদণ্ডকে গল্পের কাহিনী কথককে ধারণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। কারণ তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতার কণ্ঠস্বরে বাপ পিতামহের বৃত্তি গ্রহণ করেছে সে। 'আড়াইশো বছর আগে মহাতান্ত্রিক এক ব্রাহ্মণ আমার জড়চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন। রাজা রামজীবনের পুরোহিত আমায় মন্ত্রবলে প্রাণবন্ত করেছিলেন (ভট্টাচার্য ২৭৮)।' লোহার খড়্গের মুখে এই তন্ত্রসাধকের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এ খড়্গ ধারণ করে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করত কামার সন্তান। আর দেবীর সামনে তাকে শপথ করে বলতে হয়েছে রমণীর চরণ ভিন্ন মুখের দিকে তাকাবে না। (১/২৭৯) এ-গল্পে ছেত্তার ধর্মীয় বিধিবিধানের এভাবেই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ছেত্তার আত্মহত্যাও সম্পন্ন হয় ধর্মবিশ্বাস থেকে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে 'ঢেকা'র রাজা রামজীবন রায়ের রাজনৈতিক গোলযোগে মুর্শিদকুলী খাঁ রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হওয়ার মুহূর্তে মন্দিরে ছাগশিশু বলি দিতে গিয়ে ছেত্তা অঘটন ঘটায়। মহাষ্টমীর বলি দ্বিচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্ধছিন্ন ছাগশিশু দ্বিচ্ছেদ হওয়ায় কর্মকার রামসাগরের বাঁধা ঘাটে রানার ওপর কোপ মেরে খড়্গটি বসিয়ে দিয়ে কাপড়ে পাথর বেঁধে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। এর পূর্বে সে নাটমন্দিরে নারী কণ্ঠ শুনেছে 'এ হত্যার কাজ তুমি ছেড়ে দিয়ো। একাজ তুমি কর না।' (১/২৮২) মহাষ্টমীর বলির সন্ধ্যার বর্ণনায় কর্মকারের মানসিক অবস্থা :
- "সন্ধ্যায় স্নানান্তে খড়্গ হাতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। উৎকণ্ঠিত জনতা চারিপাশে করজোড়ে দাঁড়াইয়াছিল। নারীকণ্ঠের উলুধ্বনি উঠিতেছিল। তাহার মধ্য হইতে একটি কণ্ঠ আমি চিনিতে পারিলাম। সর্বাঙ্গ আমার কাঁপিতেছিল যে খড়্গখানা একদিন আমার কাছে পালকের মতো হালকা ছিল সে আজ যেন হইয়া উঠিয়াছে পাষাণের মতো গুরুভার আলোকোজ্জ্বল মুক্ত দ্বারপথে দেবীমূর্তি ধূপ ধুমে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে– আমার চোখের দৃষ্টিপথও আজ রুদ্ধ। দেবী মূর্তি আজ আমার সম্মুখে নাই'' (১/২৮৩)।

এ অবস্থার পর পুরোহিতের আদেশে বলি দিতে গিয়ে অঘটন ঘটে। রাজা ক্ষুদ্ধ হলে সে আত্মবলি দিতে উৎসাহী হয়। রামসাগরে এসে খড়্গ পাষাণভিন্ন করে প্রোথিত করে ক্রন্দনরত কর্মকার নিজেকে অপরাধী ভাবে। রাজা খড়্গের পাষাণ প্রোথিত করা দেখে তাকে মার্জনা করলেও তার বিশ্বাস–দোলাচল তাকে আত্মহননে প্ররোচিত করে। 'সে নিজে রাজার কালী বাড়ির শক্তিমান ছেত্তা হয়েও মনে মনে এই জীবহিংসাকে অপছন্দ করেছে। তার ব্যর্থতা এসেছে এই অপ্রবৃত্তি থেকেই (সামাদী ৫৪)।' তারাশঙ্কর এই গল্পে কুলধর্মে শাক্ত তান্ত্রিক হয়েও অহিংসার

পক্ষে তার চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছেন। অভ্যাসবশে নিষ্ঠুর হন্তারক থেকে অন্তরাত্মায় করুণাময় হয়ে উঠেছে ছেত্তার কাহিনী।

- আসলে 'খড়গ' গল্পে শাক্ত আচার ও বিশ্বাস হিসেবে বলি প্রথার চিত্র ও ছেত্তার জীবনে তার প্রভাব ও প্রভাবমুক্তির চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে লেখক 'ট্যারা' গল্পে বাঙালির ধর্মীয় জীবনে শাক্তপীঠের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। বীরভূমের একান্ন পীঠের একটি মহাপীঠ গ্রাম প্রান্তের দেবায়তন এই গল্পের পটভূমি। বাউরি অনাথ সন্তান ট্যারা যার পিতা ছিল দিনমজুর গরিব নয়ান, তারই কাহিনী এই গল্পে বর্ণিত। গ্রাম প্রান্তরের দেবায়তন আরণ্যক পরিবেশে দেবী বিরাজিতা। গদিয়ান মহান্ত পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী, সেবাইত স্থানীয় জমিদার বংশ, মহান্ত নির্বাচন করেন তারাই। গদিয়ান মহান্ত হল সেবাইত জমিদারের অধীন (১/৩১৭)।
- শাক্তধর্মসম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা বংশগত বলেই লেখক শাক্ত মন্দির কেন্দ্রিক জীবনধারা এই গল্পে তুলে ধরতে পেরেছেন নিখুঁতভাবে। 'স্থানটি হিন্দুর খ্যাতনামা একটি তীর্থস্থল, একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। অট্টহাসে দেবী ফুলরা, বিশ্বেশ্বর ভৈরব বিরাজমান। গদিয়ান মহান্ত পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু, অনাবৃত বিশাল দেহ, বাহুতে পঞ্জরে কাটা ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। এগুলি যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। তিনি পূর্বে ছিলেন সৈনিক এখন লইয়াছেন সন্ন্যাস' (১/৩১৬)। এই সন্ন্যাসী বাউরি ট্যারাকে চেলা করে, আশ্রয় দেন দেবায়তনে গরু চরানো ও অন্যান্য কাজের বিনিময়ে। নির্জন বনভূমির মন্দির মুখরিত হয় দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। বলিদান হয়।
- নিবিড় বনের শাক্ত পরিবেশে সুউচ্চ দেব-ভবন, নাটমন্দির, তার সামনের 'পুষ্করিণী'। মন্দিরের পিছনে আশ্রম মহান্তের পঞ্চমুণ্ডীর আসন, ভোগমন্দির, গোশালা। এই তন্ত্রসাধনার আরণ্যক পরিবেশে ও গ্রামীণ মানুষের সম্পৃক্ততায় গল্প কেবল বলিদানের বীভৎসতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বলিদানে রক্তপাতের আনন্দে ট্যারা অংশ নেয়। ট্যারা মন্দির থেকে বিতাড়িত হয় দুষ্টবুদ্ধির জন্য। তিন বছর পর তার আগমন সন্ন্যাসী হয়ে। চলনে বলনে সন্ন্যাসী রূপ থেকে মহান্তের অন্তিম নির্দেশে সে সংসারে ফিরেছে। নিম্নবর্গ ট্যারার জীবন ইতিহাসের সঙ্গে মহাপীঠের শাক্ত ধর্মাচার সম্পৃক্ত হয়ে গল্পটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। এ-গল্পে গাঁজা খাওয়ার প্রচলনটি তন্ত্রসাধনার সঙ্গে বিজড়িত বিষয়।
- তান্ত্রিক সাধনার জীবন্ত গল্প 'ছলনাময়ী'। এই গল্পে কয়লাখনির ম্যানেজার তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছিল। নিজের কন্যার স্বামী খনির সার্ভেয়ার কানাই চক্রবর্তীর (কম্পাস) শবদেহের ওপর বসে সে শবসাধনায় প্রবৃত্ত হয়। বিধবা কন্যার আর্তনাদে সম্বিত ফিরে পেয়ে উন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ তার শবসাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শবাসন ত্যাগ করে অহরহ বিধবা কন্যার ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠায় তার অমানুষী, নিষ্ঠুর সাধনা পেয়েছে মনুষ্যত্বের রূপ। কারণ তারই প্ররোচনায় কুলি সর্দার কানাইকে হত্যা করে শব গায়েব করে তাকে দিয়েছিল। এই পাষণ্ড প্রবৃত্তির কারণ সুলক্ষণ জীবন্ত মানুষের শব হিসাবে কানাই ছিল সর্বলক্ষণযুক্ত।
- তান্ত্রিক সাধনা এখানে ম্যানেজারকে পৈশাচিক করে তুলেছে। তাঁর বিশ্বাস তান্ত্রিক সাধনায় মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। মধ্য জীবনে সন্ন্যাস নিয়ে তন্ত্রসাধনায় তিনি শক্তি লাভের সাধনা করেছিলেন। জীবনে অর্থ, ভোগ, সম্মান প্রভুত্ব কামনা করেই তার সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া। কিন্তু সজ্ঞান চঞ্চলা ছলনাময়ী তাকে প্রতারণা করেছে। জলকে সুমিষ্ট শরবতে পরিবর্তন ও হাতের তালুতে মিষ্টি গন্ধ সৃষ্টি করতে পারা ছাড়া আর কোনো শক্তি তার অর্জিত হয়নি। এতে সন্তুষ্ট নন ম্যানেজার। সম্রাটের মতো অসীম শক্তি,

ভোগ ও প্রভুত্ব তার চাই। পাঁড় মাতাল ম্যানেজারের অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহচিন্তা নেই। স্ত্রী-কন্যাকে প্রহার করেন তিনি। খনির অন্যরা তাকে ভয় পায়। অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ধনী শ্বশুরের একটি কলিয়ারির ঠিকাদারিতে এসে তাকে প্রথম দেখায় মনে হয়েছে 'প্রান্তরের বুকের অদূরবর্তী ঘনান্ধকার পটভূমির সম্মুখে সে মূর্তি যেন এক অদ্ভুত শোভন রহস্য' (১/৩২৬)। স্থিরদৃষ্টি নিমেষহীন কঠিন। ক্ষুদ্র চোখ, মুখের নিম্নাংশে দাড়িগোঁফ সমাচ্ছন্ন, কাঁচাপাকা দীর্ঘ রুক্ষ চুল বিশৃঙ্খল প্রকৃত সাধকের চিত্র। তান্ত্রিক সাধক ছলনাময়ীকে স্ববশে এনে অনন্ত ভোগ, অসীম প্রভুত্ব পেতে চান। তাই নদীর ধারে শ্মশানে তিনি সাধনার জন্য অমিয়ের কাছে অর্থ পাওনা চেয়েছেন। পুনরায় সাধনার জন্য অর্থের সঙ্গে শব প্রয়োজন। অসীম ক্ষমতালিপ্সু তান্ত্রিক ম্যানেজার পূর্বের তন্ত্রসাধনায় তার ব্যর্থতার বর্ণনা দিয়েছেন :

- এই সাধনা থেকে প্রাপ্তিতে তৃপ্তি পাননি তান্ত্রিক। স্নেহ-মমতা বিসর্জন দিয়ে সর্বশক্তি অর্জনে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক। 'জীবন্ত মানুষকে শব প্রস্তুত' করে নিতে চেয়েছেন। পরিবারকে প্রহার করার পক্ষে তার যুক্তি 'তারা আমার আয়ত্তাধীনে আছে।' (১/৩৩১) ম্যানেজার তার নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণে উন্মত্ত, মোহে অন্ধ। তাই গৃহত্যাগ করে সাধনার উদ্দেশ্যে। কম্পাস ও ম্যানেজার কন্যার বিবাহের পর কম্পাসের ঘরে সাপ নিক্ষেপ করে ম্যানেজার অমিয় বাবুর কাছে অর্থ চেয়ে বিফল হন। নিরুদ্দেশে যাবার চিত্রটি গৈরিক প্রান্তরের গৈরিকবসনা সন্ন্যাসিনী প্রকৃতির সাযুজ্যে চিত্রিত। 'অস্থির পদক্ষেপে খর্বাকৃতি অসম্ভব প্রয়াসী বাহির হইয়া গেলেন। উন্মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া অমিয় দেখিল– সম্মুখে রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর-বক্ষের শেষ সীমায় চিক্-চিক্ করিয়া কাঁপিতেছে মরীচিকার প্রবাহ। দগ্ধ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অস্থির পদক্ষেপে খর্বাকৃতি তান্ত্রিক চলিয়াছেন সম্মুখের পানে।' রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর, মরীচিকার প্রবাহ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ তান্ত্রিকের পরিণাম সঞ্চারী। তার জীবনে প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধের ইঙ্গিত। তান্ত্রিকের কন্যাকে দেখে অমিয় মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়েছে: 'এই সেই কঠোর তান্ত্রিকের সন্তান, সন্ধ্যাকাশের গোধূলি–তারার মত শুভ্র, প্রশান্ত, সুন্দর।' (১/৩৩৩) সন্ধ্যাকাশের গোধূলি তারার মত শুভ্র মেয়েটির জীবনে শ্মশান, নরকঙ্কাল ও শবসাধনা নিয়ে আসে হাহাকার। কম্পাসকে পরিকল্পিতভাবে খাদের ভিতরে ধ্বস নামিয়ে হত্যা করা হয়। নীরন্ধ্র অন্ধকারে, শ্মশানের মাঝে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত সেখানে কম্পাসের কুশপুত্তলী দাহের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সদ্যবিধবা কন্যার করুণ আর্তনাদে, 'জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে শবারোহী খর্বাকৃতি তান্ত্রিক লাফ দিয়া আসন ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল– দূর দূর দূরহ' (১/৩৩৬)। সদ্যবিধবা কন্যার আর্তধ্বনি তান্ত্রিককে নির্মম কশাঘাতে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। দশবছর পর বালীগঞ্জ পার্কে অমিয়ের সঙ্গে তান্ত্রিকের দেখা হলে বলেছে 'শবাসন ছেড়ে উঠে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। অহরহ বিধবা কন্যার ছবি চোখের ওপর ভাসত। আমি অস্থির হয়ে চিৎকার করে ছুটে বেড়াতাম। এখনও কখনও কখনও হয়। (১/৩৩৭)।

- তান্ত্রিকের তন্ত্রসাধনায় রাক্ষসী ছলনাময়ী ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অতি যন্ত্রণায় সম্বিত ফিরে আসে বলেই হাত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে। উৎকট তান্ত্রিক সাধকের ব্যর্থতার কাহিনী 'ছলনাময়ী'। 'ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আমন্ত্রণে প্রথমবারে ঘটে ছিল তার ব্যর্থতা। সেওতো পার্থিব মানবিক দুর্বলতা। এবারে গভীরতর দুর্বলতা– বাৎসল্য। জামাতার শবদেহে বসে সাধনা ভেঙেছে কন্যার আর্তক্রন্দনে, যে কন্যার প্রতি বাৎসল্য সে শাসন করেছিল বলে স্থির বিশ্বাস ছিল (সামাদী ১৪)।' ''পুত্রেষ্টি'' গল্পে শ্মশানচারী ভীমকায় উগ্রদর্শন সন্ন্যাসী কালী সাধকের নরবলি প্রদানের ইচ্ছের সঙ্গে বাঁড়ুজ্জে বাড়ির নিঃসন্তান মেজোকর্তার সন্তান কামনার ঘটনা একাত্ম হয়েছে। উচ্চবর্গ মেজকর্তার বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন সন্ন্যাসী। যে সন্ন্যাসী 'মড়া খায়'। শ্মশানে ধুনির সামনে বসে থাকেন। অপরিচিত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকতে পারে, বাড়ির খবর বলতে পারে। এই আশ্চর্য সন্ন্যাসী গঙ্গার তটভূমির উপর ঘন জঙ্গলের পাশে শ্মশানে বসবাস করে। জনশূন্য শ্মশানে অগ্নিকুণ্ডের সামনে গঙ্গার

দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন। নর-কপালের পাত্রে পানীয় পান করে। মেজোকর্তা 'শাক্ত ব্রাহ্মণবংশের সন্তান' (১/৪৫৪) সন্ন্যাসীর মাটির পাত্রে মায়ের প্রসাদ পান করতে বললে পান করে।

- সন্ন্যাসী 'কালী সম্পর্কে বলেছেন শিববাক্য লঙ্ঘন করতে পারে একজন যে শিবের বুকে চড়ে নাচে। সে তার কালীমা। এই কালীমাকে তুষ্ট করতে পারলে সন্তান জন্মাবে। তিনি বলেন, তন্ত্রমতে আমি তোর জন্যে মায়ের কাছে পুত্রেষ্টি যাগ করব।' (১/৪৫৪) অমাবস্যার অন্ধকারে গভীর রাতে দূর শ্মশানে নরবলি দিতে বললে মেজকর্তা রাজি হয়। মেজকর্তা তন্ত্রমতে জপ তপ সুরা পান করে। সন্ন্যাসী সেবাও স্বাভাবিক কাজ। শ্মশানে পুত্রেষ্টি যাগ করার জন্য মেজগিন্নীর বুকের কাছে আশ্রিত পোষ্য খোকাকে শ্মশানের উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েও ফেরত আনে বিবেক তাড়িত হয়ে। 'সুরাপ্রভাবিত মস্তিষ্কের' স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা নষ্ট হওয়ায়, অপরের পুত্রকে নরবলি দেয়ার বিনিময়ে পুত্রলাভের নিষ্ঠুর বাসনাকে পরাজিত করেছে এক সন্তানহারা কুকুরের আর্তনাদ যা মেজকর্তাকে সুরাপানোন্মত্ত অবস্থায় সর্তক করেছে। স্বাভাবিক বুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় সন্তানের ক্ষুধা তাকে কালীসাধকের কাছে নিয়ে গেছে। রুষ্ট তান্ত্রিকের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পেরেছে মেজকর্তা। অনাথ শিশুকে বলি দেওয়ার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা থেকে মেজকর্তা রক্ষা পেয়েছে। 'তন্ত্রসাধনার উপায় আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে গল্পলেখকের তীব্র বিরূপতারই প্রকাশ ঘটায়' (গিরি ৭৫৩) এই গল্পে। 'ছলনাময়ী'র মতো শাক্ততান্ত্রিকতার নিষ্ঠুরতা 'পুত্রেষ্টি' গল্পেও রূপায়িত হয়েছে। তবে লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ তন্ত্রসাধনার নানা স্তরে উভয় গল্পে মানবিকতাপ্রাপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
- 'প্রতিধ্বনি' গল্পে রসরাজ ঘোষাল 'কালী সাধনা' করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছেন (১/৫২৯)। লেখকের দিদিমা বলেছেন, "মা দেখা দেবার আগে, নানা বীভৎস ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আসেন কিনা সাধককে ভয় দেখাতে। সেই রকম এক মূর্তি দেখে উনি ফুঃ ফুঃ করে আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। সেই অবধি অহরহ ফুঃ ফুঃ করেই বেড়ান। (১/ ৫২৯) গল্পে রসরাজের যে চেহারার বর্ণনা তা একান্তই কালীসাধকেরই। 'অস্বাভাবিক মূর্তির মুখ, মাথায় বিশৃঙ্খল দীর্ঘ রুক্ষ চুল, দীর্ঘ শ্মশ্রু গুম্ফে সমাচ্ছন্ন মুখ, চোখে প্রখর দৃষ্টি, সে মূর্তি দেখিয়া ভয় হয়।" (১/৫২৮) কলেজে বি এ পর্যন্ত পড়েছে, পাশ করেনি রসরাজ। কলেজে পড়ার সময় রাত্রির পর রাত্রি শ্মশানে কাটিয়েও মৃত্যু কি, কি তার রূপ, কোথায় বাস সে প্রশ্নের উত্তর পায়নি। এখন পাগল হয়ে চারিপাশে মৃত্যুকে ফুঃ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ নির্জন নদীতীর ও শ্মশান এবং রসরাজের নিয়মিত মৃত্যুজিজ্ঞাসায় সমীকৃত হয়েছে।

'চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস' গল্পের চণ্ডীচরণ কালী উপাসক ও প্রাচীন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক পণ্ডিত বংশের সন্তান। অকৃতদার চণ্ডী তন্ত্রসাধনা ও জপতপ নিয়েই সময় কাটায়। সংসারে একমাত্র আত্মীয় ভাগ্নী চিন্ময়ী। চিন্ময়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করে সন্ন্যাসী হতে চেয়ে কালীমন্দিরে আশ্রয় নেয় সে। কিন্তু মদের দোকানের বাকি পাওনা পরিশোধের জন্য ভাগ্নীকে একখণ্ড জমি দোকানিকে দিতে বললে ভাগ্নী অস্বীকৃতি জানালে চণ্ডীরায়ের বিষয়াসক্তি চাওড় দিয়ে ওঠে। চিন্ময়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মামলায় জয়ী হয়েছে চণ্ডী। বিষয়াসক্তি চরিত্রটিকে জীবন্ত মানুষের জটিলতায় উজ্জীবিত করলেও বৈরাগ্য বা তন্ত্রসাধনা ব্যাহত করেছে। সংসারবিমুখ চণ্ডী শেষে গৃহে চিন্ময়ীকে না দেখতে পেয়ে প্রকৃত অর্থেই গৃহত্যাগী হয়েছে। বৈরাগ্য পরাজিত হলেও কুলুপ চাবি খোঁজায় তার বিষয়াসক্তি জয়ী হয়েছে।

এই গল্পে লাভপুরের পীঠস্থান ও সেখানকার দেবী চণ্ডীকার প্রসঙ্গ আছে। 'ট্যারা' গল্পে অট্টহাস এর পরিচয় থেকে এই পরিচয় বিস্তৃত। সতীর অধর-ওষ্ঠ পড়েছিল এজন্য এখানকার মন্দিরে অঙ্গ আকৃতিহীন একটি বড় শিলা ফুলরা ও অট্টহাস নামে পরিচিত। শ্মশান সন্নিহিত জঙ্গলাকীর্ণ এই পীঠ অতিপ্রাচীন তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্র। লাভপুরের

শক্তিপূজার ঐতিহ্য ব্যক্ত করতে এই পীঠের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন– 'লাভপুর থানার সিদ্ধল গ্রামে ভট্ট ভবদেবের মহাদেব ও অট্টহাস নামে দুই ভাই ছিলেন। অট্টহাস সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাধনভূমি ছিল লাভপুর। ফলে পরে ফুল্লরাপীঠের নাম হয়েছে অট্টহাস (মুখোপাধ্যায়২: ২৩৪)।'

- ''রায়বাড়ি'' গল্পের জমিদার রাবণেশ্বর রায় কালীসাধক। বৃহৎ নাটমন্দির ও কর্তার নতুন মহালের নাম 'হুদ্দা-শ্যামপুর–কালী মায়ের নতুন মহাল' থেকে এ-সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। রায়–তারা-তারা উচ্চারণ করেছেন হুদা- শ্যামপুরের প্রজা শুনে। তাঁর মন্দিরটি দেবী মন্দির। 'রায় কর্তা জপমালা লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন– তন্ত্রমতে সন্ধ্যাতর্পণ জপ করিবেন।' (১/৫৯৩) বীজনগর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আকস্মিক ঝড়ের তাড়নায় ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিতে পড়ে বজরা ডুবিতে রায়গিন্নী ও পুত্র বিশ্বেশ্বর মৃত্যুবরণ করলে সেই সংবাদ কালী বাগদি কর্তাকে জানানোর পর লেখকের বর্ণনায়– 'তারপর অন্ধকার স্তব্ধ রায়বাড়ি। গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে রব উঠিতেছিল, তারা-তারা'। (১/৫৯৮) দরিদ্র নরনারী বন্যার সময় আশ্রয় নেয়– কালীবাড়ি–গোবিন্দবাড়িতে। ফলে বোঝা যায় তান্ত্রিক-বৈষ্ণবের সহাবস্থান সম্পর্কে। (১/৬০০) লেখকের বাণী স্মরণীয়: 'কাছারি পার হইয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দির, তাহার পর জগদ্ধাত্রীর বাড়ি, তাহার পর একেবারে গঙ্গার কূলের উপরেই রায় চৌধুরীদের কালীবাড়ি। গঙ্গা যখন কূলে কূলে পাথার হইয়া উঠে, তখন কালীবাড়ির বাঁধা ঘাটের প্রশস্ত চত্বরের গায়ে গঙ্গার জল ছল-ছল করিয়া আঘাত করে। ভিতরে দক্ষিণমুখী মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ সুউচ্চ নাটমন্দির, নাটমন্দিরকে পরিবেষ্টন করিয়া তিন দিকে খিলানের বারান্দাযুক্ত সারি-সারি একতলা ঘর।'(১/৫৯১) মন্দিরের ঠিক সামনেই দক্ষিণে বামে সুবৃহৎ দুই যূপকাষ্ঠ– অর্থাৎ বলি প্রচলিত ছিল। রাবণেশ্বর স্ত্রী পুত্রের মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছেন– এখানেও তার তান্ত্রিকতায় বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।
- ''ট্রিটি'' গল্পে বৈষ্ণবধর্মী ব্রাহ্মণবংশের সন্তান রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শাক্তবংশের সন্তান কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সংঘাতের চিত্র কৌতুকময় করে পরিবেশন করা হয়েছে। দুই ধর্ম গোষ্ঠী পারস্পরিক সহাবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরোধের বিষয়গুলো লেখক ব্যঙ্গাত্মকভাবে এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন। দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের আচরণ ও বিশ্বাসের চিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর উদারতা দেখিয়েছেন। এই দুই চরিত্র উভয়েই উভয়ের ভগ্নিপতি অর্থাৎ উভয়েই উভয়ের শ্যালক (ভট্টাচার্য২: ১৯৭)। ''ট্রিটি'' হাস্যরসাত্মক গল্প। এই শ্রেণির গল্পগুলিকে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন– 'আড়ষ্ট ও ম্রিয়মাণ' (ভট্টাচার্য ৩৪)। ধর্ম ও ভক্তি শূন্য দুই চরিত্রের দ্বন্দ্বে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন গল্পকার। কালীচরণ কারণসলিলে নিমজ্জমান ও রাধাচরণ গঞ্জিকাসেবনে 'ব্যোমমার্গী'। অথচ উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ের মৌল বিরোধকে লেখক বাস্তবতায় তুলে ধরেন শত্রুভাব। ছাত্রজীবনে তাদের বন্ধুত্ব, প্রেম বিবাহ ও পরস্পর আত্মীয়তা প্রভৃতিই কৌতুককর। বলির বিরুদ্ধে রাধাচরণ, কালীচরণ বলির পক্ষে। দুজনই তাদের শিষ্যদের একে অপরকে প্রভাবিত ও উত্তেজিত করেছে কিন্তু মামলায় তারা ভগ্নিপতিদ্বয় লাভবান হয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত যে দ্বন্দ্ব দেখেছেন তা এই গল্পে উপেক্ষিত :

  • বাঙলাদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা সুপ্রসিদ্ধ। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে দম্ভপূর্বক বিষহরীর পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর গীতে জাগরণ এবং মদমাংস দিয়া বাসুলী পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই পটভূমির উপরে বৈষ্ণবধর্মের জাগরণ। ফলে শাক্ত ধর্মের সহিত দ্বন্দ্ব-কলহ অনিবার্য। নবদ্বীপে এই দ্বন্দ্ব-কলহ বহুদিন পর্যন্ত চলিয়াছে। তাহার চিহ্ন আজিও বর্তমান। এখন পর্যন্তও বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান উৎসব রাসযাত্রার পূর্ণিমা রাত্রিতে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির তেমাথা-চৌমাথায় বিরাট বিরাট দেবীমূর্তি

প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাসমারোহে পূজিতা হন (দাশগুপ্ত ২২৩)।' তবে এই দ্বন্দ্বের সমন্বয় দেখা যায় শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিদের রচনায়। তারাশঙ্কর দ্বন্দ্বের সমন্বয় চেয়েছেন বিভিন্ন গল্পে।

- ''ডাইনী'' গল্পে গ্রামের প্রান্তে বুড়াশিবতলার কথা আছে। (২/২৪৫) বিতাড়িত ডাইনীর গ্রামে তারাদেবীর পূজা হয়। 'বাকুলের তারাদেবীতলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমায় আগের প্রতি চতুর্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করে দাও। আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।' (২/২৪৮) ছাতিফাটা মাঠের পূর্বপ্রান্তে দলদলির জলা। এই জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের আমবাগানে ডাকিনী-ভীষণ শক্তিশালিনী। নিষ্ঠুর ক্রূর এক বৃদ্ধা ডাইনী চল্লিশ বছর ধরে বাস করে। গ্রামবাসীর অন্ধ সংস্কার অপবিশ্বাসের জন্য একজন সাধারণ অনাথা মেয়ে ডাইনীতে পরিণত হয়। ক্রমাগত দোষারোপে ডাইনীর নিজের বিশ্বাস জন্ম নেয় সে ডাইনী– এই ডাইনীতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুঁকের দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করে। ওঝা, গুনিন এরা ডাকিনীদের দুষ্কর্মের প্রতিবিধান করে তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা। গুনিনের মন্ত্রপ্রহারে ডাইনী আকাশ পথে যেতে যেতে গাছের ডালে বিদ্ধ হয়ে মরে। এই বিশ্বাস লোকাচার অপবিশ্বাস। গ্রামের অপবাদ যেমন সুরধুনীকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করায় তার অনাথা লোভী ক্ষুধার্ত অবস্থা ও পূর্বজন্মের পাপে তার ডাইনীত্ব। তারাদেবী তথা কালীমন্দিরে প্রার্থনা করেও তার প্রার্থনা পূরণ হয়নি। এ-গল্পের বাতাবরণে তারামন্দির ও গুনিনের মন্ত্রতন্ত্রের কথায় শাক্ত অনুষঙ্গ উন্মোচিত হয়েছে।

অজয়ের তীরে বৈষ্ণব আখড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সাধনার পীঠস্থানও নদীতীরবর্তী অরণ্যে গড়ে উঠেছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ''একরাত্রি'' গল্পের পটভূমি উন্মোচনে। পটভূমিতে শক্তিদেবীর মন্দির ও তন্ত্রসাধনার স্থানে অজ্ঞাত পরিচয় প্রৌঢ় ও তরুণ– এই দুজন সন্ন্যাসীর যথাক্রমে পুত্র ও পিতাকে অন্বেষণের চলতি পথে আশ্রয়হীন হয়ে আশ্রয়স্থল হিসেবে পীঠস্থানে আকস্মিক সাক্ষাতের কেন্দ্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। দু'জনের কথোপকথনে ও কর্মকাণ্ডে পরিচয় উদ্‌ঘাটিত না হলেও এদেরই একজন পিতা রূপলাল ও অন্যজন যে পুত্র কার্তিক এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। তরুণ সন্ন্যাসী রূপলালের যৌবনের কথা ও প্রৌঢ় সন্ন্যাসী কার্তিকের বাল্যের কথা বলেছে। মানবিক প্রেম ও বাৎসল্য এই দুজনের গল্পে প্রাধান্য পেলেও ''ছলনাময়ী'' কিংবা ''পুত্রেষ্টি''র মতো তন্ত্রসাধনার ভয়াল পরিবেশ এই গল্পের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নি। ভয়াল পরিবেশে জীবন বাসনার উগ্রপ্রখর রূপ এসেছে দুজনের কথোপকথনে। কিন্তু গল্পের শেষে পরস্পরের সন্ধানে আবার দুজন বের হয়। প্রৌঢ় দক্ষিণ দিকে সমুদ্র কিনারে চলল আন্দামান দ্বীপে কার্তিকের অন্বেষণে, আর তরুণ হিমালয়ের দিকে রূপলালের খোঁজে মূলত অজানার পথে পা বাড়ানোর মধ্যে দুই গেঁজেল মাতাল সন্ন্যাসীর অন্তর আলোকিত হয়েছে।

এই গল্পে সমাজসংসার থেকে দূরে শ্মশানের ভয়াবহ রিক্ততার মধ্যে অরণ্যের সংসার দূরবর্তী নির্জনতায় পীঠস্থানকে ঘিরে গড়ে ওঠা নানা কিংবদন্তিকে আশ্রয় করে পটভূমি বিবৃত হয়েছে। লেখক বীরভূমের কঙ্কালীতলা, তারাপীঠ লাভপুর বক্রেশ্বর প্রভৃতি শাক্ত পীঠের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। সংসার সমাজ থেকে দূরবর্তী শাক্ত মন্দিরের পটভূমি জীবনের অনিত্যতা ও ভয়ালতাকে উপস্থাপন করেছে।

''প্রহ্লাদের কালী'' গল্পে নিম্নবর্গের শাক্তরূপটি স্পষ্ট। কুলধর্মে ডাকাত প্রহ্লাদ ভল্লা আঠারো বছর বয়সে শ্মশানবাসিনী মা কালীর মেয়ালদহড়ার জঙ্গলের সাধন ভজনরত ফৌজদার বাবা সাধুর একটি তলোয়ার যা দিয়ে ঠেঙো এক পায়ের সন্ন্যাসী পাঁঠা বলি দিত তা কুক্ষিগত করার জন্য কালী পূজা শুরু করে। ফৌজদার বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পরও ডাকাত প্রহ্লাদকে তলোয়ার ছুঁতে নিষেধ করেছিলেন বাবা, কারণ কালী মায়ের কৃপায় মায়ের

কাছে বলি দেন এটি দিয়ে। কালী মায়ের কাজে ছাড়া কোনো কাজে তলোয়ারটি ব্যবহার করা যাবে না বলে সে কালীপূজো শুরু করে। 'শেয়ালদহড়ার শ্মশানবাসিনী কালী, যিনি শিবের বুকের উপর সামনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন' তারই স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সে কালীপুজো শুরু করে। এমনকি কালী প্রতিষ্ঠা করে। তলোয়ারটি ফৌজদার বাবা তাকে দান করেন। পুজোয় প্রতিমা পাওয়ার অনিশ্চয়তার মুখে রতিলালের কাছ থেকে কাঠামো বেঁধে নিয়ে সে নিজেই কালী প্রতিমা সম্পন্ন করে। কালী পূজার দিন অপরাহ্নে শিষ্য, বন্ধু ও বিবিধ উপকরণ এলে পূজা সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ দিন হয়েছে ফৌজদার বাবার অস্ত্র দিয়ে বলি দানের। বর্তমানে ডাকাতি তার পেশা নয় বরং সে মদ ও গাঁজা বিক্রি করে। এরই মধ্যে কালী সেবা–তার কাজ। ঘোরভক্ত প্রহ্লাদ।

মা-কালী এসেছেন আজ কুড়ি বছর। অমাবস্যায় সংক্রান্তিতে সে বলিদান করেছে। ফৌজদার বাবার সিদ্ধ তলোয়ার। এই তলোয়ারে যখন বলি হয়, মা-কালীর জিভ লকলক করে। এই তলোয়ারের বলি নিতে তার ওই মা-কালীকে জাগতে হয়েছে। তার মা-কালী খেলার পুতুল নয়। এই তলোয়ার নিয়ে কখনও সে ডাকাতি করে নি। লাঠিই নিয়ে গিয়েছে। তারপর বোধ হয় দুবার সে ডাকাতি করেছে। আর না। সেই খতম। এই অস্ত্রখানা ধরতে পারে না বলেই ছেড়ে দিয়েছে। আঠারো বছরের মধ্যে ও-কাজ সে করেনি। চোলাই মদ বেচে খায়। চোরাই গাঁজা বিক্রি করে। ওই হাতিয়ার আর মা-কালী। মা-কালী আর ওই হাতিয়ার। কি হল তার কে জানে। স্ত্রীর নেশা, স্ত্রীলোকের নেশা, সংসারের নেশা– সব গেল। জয় মা-কালী। ভালই হয়েছে। সদানন্দময়ী কালী। (৩/১৭২)

প্রহ্লাদের কালী প্রতিমা থানার দারোগা জুতো পায়ে ছুঁয়ে দিলে সে প্রতিমাকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করেছে। সত্তর বছরের কাছাকাছি প্রহ্লাদের কালীপ্রীতি লেখক ভল্লা জীবনের ধর্মীয় অবস্থার চিত্রে তুলে ধরেছেন। 'বিচিত্র প্রহ্লাদ। বিচিত্র তার পূজাপদ্ধতি এবং শাস্ত্র। সন্ধ্যাবেলায় সে ঢাকি ডেকে নিয়ে এল। বাজাও ঢাক। কালী-মা চামড়া ছোঁয়া পড়েছে। মা চান করতে যাবে।' (৩/১৬৫) স্নানের পর ঢাকিকে বলেছে পরদিন সন্ধ্যায় কালীর পূজা হবে। ঢাক কাসি শিঙে সহযোগে আর ভোর বেলায় ধুমুল দিয়ে যাবে ঢাকি। আগামীদিনের পূজার চিন্তায় বিভোর প্রহ্লাদ : 'কাল নূতন করে কালীমায়ের অঙ্গরাগ করে পুজো করে তারপর তোকে দেখাবে। কাল সমস্ত দিন কাজ, মা-কালীকে মেরামত করে, রোদে শুকিয়ে, না শুকোয় তো আগুন জেলে সেঁকে শুকিয়ে রঙ দিতে হবে। তারপর পুজো। কলাগাছ চাই, ঘট চাই, সিঁদুর চাই, ডাব চাই, মিষ্টি চাই, চাল চাই, ডাল চাই, পাঁঠা চাই, কাঠ চাই, নুন-তেল-মসলা-আদা পেঁয়াজ, ফুল বেলপাতা- ফর্দ তার মুখস্থ। পাঁঠা, একটা ভাল পাঁঠা চাই। ওই সাতনা হাড়ীর একটা শিঙ-ভাঙা বড় পাঁঠা আছে। তার মা-কালীর সে-সব বাছা-বিচার নেই। শিঙ-ভাঙা, শেয়ালে ধরা, খুঁতো–এসব খুঁতখুঁতুনি নেই। বলি হলেই হল। তাজা রক্ত আর প্রচুর মাংস। পেঁয়াজও খায় তার মা-কালী।' (৩/১৬৬)

প্রহ্লাদের পূজার উপকরণে তার ধর্মীয় জীবনের বাস্তব চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। তবে 'কালীই ডাকাতের উপাস্য দেবী (ভট্টাচার্য৩: ৩১)।' কালী প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তলোয়ারের লোভ কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রহ্লাদ কালী ভক্ত। তলোয়ারটি সে লুকিয়ে রাখে। কারণ তার অঞ্চলের নতুন ডাকাত সর্দার ঘনশ্যাম দাস এই তলোয়ারটি করায়ত্ত করতে চায়। সে পিস্তল হাতে প্রহ্লাদের আস্তানায় প্রবেশ করে। অস্ত্রটি জব্দ করেছে গুলি ছুঁড়ে। জানুতে গুলিবিদ্ধ প্রহ্লাদ অজ্ঞান হয়। জ্ঞান হলে সে বলেছে গুলি করেছে মা কালী। নাটকীয় পরিসমাপ্তি ঘটেছে গল্পের। 'ফৌজদার বাবার হাত থেকে লোভের বশে সিদ্ধ তলোয়ারখানি কেড়ে নেওয়ার অপরাধবোধ তার মানসচৈতন্যে ক্রিয়াশীল ছিল। তাই তলোয়ারখানি হস্তান্তর হওয়া তার কাছে ইষ্টদেবীর অন্তর্ধানেরই প্রতীক (ভট্টাচার্য৩: ৩১)।'

প্রহ্লাদের ডাকাতি জীবন কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। পিতার মতই দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল তরুণ বয়সে রাঁয়বেশে নৃত্যে পারদর্শী ছিল। প্রকাশ্য হত্যা, মারলুট করা ও লাঠিতে ভর দিয়ে ত্রিশ মাইল দ্রুত অতিক্রম করে পুলিশকে বোকা

বানিয়েছিল সে। ডাকাতির সময়েই তার কালী ভক্তির সূচনা। ডাকাতি ছেড়ে দিলে কালীকে সে সমস্ত বোধ বোধি বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়ে আগলে রেখেছে। বয়সের কারণে সে ভক্তিশীল তবে নিবৃত্তিহীন। অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তিতে কালী পূজা করে সে। মদের ব্যবসা করে সে বর্তমানেও অপরাধ জগতের বাসিন্দা। কালী প্রতিমার নিচে গোখরো পোষা, লুকিয়ে রাখা তরবারি, পত্নী ও সন্তানদের অবহেলা কালীকে জুতা পায়ে স্পর্শ করায় শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি এবং তার উদ্ভট পূজা পদ্ধতি সবই জীবন সংলগ্ন। 'সব কিছুতেই একটা বলিষ্ঠ মানুষের, অনুশোচনাহীন মানুষের মূর্তি (সামাদী ২৭২)।' নতুন ডাকাত ঘনশ্যামের কালীভক্তি নেই। কিন্তু পিস্তল থাকা সত্ত্বেও তলোয়ারটি নিতে বদ্ধপরিকর। প্রাক্তন ফৌজি ও বর্তমানে সন্ন্যাসীর বলি দেওয়ার তলোয়ার শত্রুনাশী যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েও সেটি প্রহ্লাদের হাতে আসে। প্রহ্লাদ থেকে নবীন ডাকাত সর্দার ঘনশ্যামের হাতে। ডাকাতির ঐতিহ্য পরম্পরা হয়। মূলত প্রহ্লাদ ভলার ডাকাতির জীবনে মা-কালীর আশ্রয় ও শেষে কালীমার বিদায় ও নতুন ডাকাত সর্দারের আবির্ভাব তার অতীতের উজ্জ্বল জীবন ও বর্তমানের ব্যর্থতার কাহিনী হিসেবে গুরুত্ববহ।

''সখী ঠাকরুন'' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শক্তিসাধিকা। বীরভূমের প্রাচীন গ্রাম বিল্বগ্রামের দেবীর নাম বিল্ববাসিনী। কথিত আছে মদনভস্মে হতমানিনী উমা, এখানকার এই বিল্বতলে এসে দুশ্চর তপস্যা শুরু করেন। তাঁর তপস্যায় আকৃষ্ট শিব এসে দ্বারপ্রান্তে ভিক্ষুনাথরূপে দাঁড়িয়ে আছেন, আর এই দেবস্থানে তপস্বিনী উমার আজ্ঞাবাহিনী এবং সকল কিছুর ভার নিয়ে রয়েছেন যিনি–তিনি জয়া-বিজয়ার মতোই তাঁর সখী। তিনিই এখানে সর্বময়ী। তিনি কুমারী ও তিনি ব্রহ্মচারিণী। তাঁরই নাম সখী ঠাকরুন। (৩/৮০৩)

বিল্বগ্রামের দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর দিকে বিল্ববাসিনীতলা, মায়ের স্থান। গাছপালায় ঘেরা, ২৫/৩০ বিঘা জুড়ে এলাকা আশ্রমের মতো। এর মধ্যে দুটো পুকুর বড় ছোট। পুকুর দুটোর মধ্যবর্তী স্থানটিতে দেবস্থল। একটি প্রশস্ত বাঁধানো বিল্বমূল হলো আসল দেবস্থল। তার পাশে একটি একতলা ঘরে দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্তি সিঁদুরে তেলে লোহিতাক্ষিনী। একটু দূরে শিবস্থান। ভিক্ষুনাথের আসন সামনের বাঁধানো চত্বরে যাত্রীরা বসে। পূজাপার্বণে উৎসব হয়। কতগুলো ঘর আশ্রমের কাজ করে। মাঠকোঠা রান্নাঘর, গোয়াল ঘর, চালা, দেবস্থানের এলাকা থেকে একটু দূরত্বে ৪/৫ দেবাংশীদের ঘর। অন্য কয়েক ঘর লোক ঠাকুরতলার কাজকর্ম করে। বিল্ববাসিনীকে পূজা দিলে বা তাঁর কাছে মানত করলে পলুপোকা বা রেশমকীট প্রতিপালনে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। সখী ঠাকুরানী চিরকুমারী ও চিরযুবতী। ১৬ বছরে নিযুক্ত হয়ে যৌবন বিগত হলে নতুন সখী ঠাকরানী নিযুক্ত করা হয়। এলোকেশী ১৬ বছর বয়সে নিযুক্তি পায়। এর পূর্বে শ্যামাদাসী ছিলেন। এলোকেশী হিতু দেবাংশীর মেয়ে। ঘনশ্যাম বিল্ববাসিনী তলার গরু-বাছুরের মাহিন্দার। ১৫/১৬ বছর বয়স। অর্থাৎ সমবয়সী। শ্যামার কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান। তার মা দেবীর থানে মারা যায়। বর্তমানে এলোকেশীর ৪৪ বছর বয়স। 'সাল ১৯৩৮। বিল্ববাসিনী পলুর কল্যাণ করেন– আর যুবতী নতুন বিয়ানো বউ-বেটীদের কল্যাণ করেন। তারা স্বামীর আদর পায় আর রূপে যৌবনে মেয়েরা ভরে ওঠে।' (৩/৮১৩) সখী ঠাকরুন পদটি পুরোনো দিনের পীঠস্থান-সদৃশ মন্দিরের ভৈরবী পদের সঙ্গে মিল আছে (সামাদী ৩১৬)।'

এ-গল্পে সখী ঠাকরুনের প্রথা, বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণের অনুষ্ঠানের সঙ্গে একাত্ম করে এলোকেশীর জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কালের নিষ্ঠুর বিধানে যৌবন গত হয়েছে তার। জীবনের এই অনিবার্য ট্রাজিক বেদনা এলোকেশী চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার।

তারাশঙ্করের উপন্যাসেও শাক্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। *ধাত্রীদেবতার* (১৯৩৯) রামজী সাধুর শাক্ত সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিক চরিত্র, *আরোগ্য নিকেতনের* (১৯৫৩) জমিদার ও ব্রাহ্মণদের তন্ত্রচর্চা, *কীর্তিহাটের কড়চা*'র (১৩৯৩-৯৬) শ্যামাচরণ, *অরণ্যবহ্নির (১৯৬৬)* ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের চরিত্রে এবং অন্যান্য কিছু চরিত্রের

নির্ভয় আচরণের পেছনে রয়েছে শাক্ত প্রভাব। ইন্দ্র রায় বিশ্বম্ভর রায় চরিত্রে শাক্ত আচার, দর্প, স্বর্গমর্ত্যের বৈষ্ণবের পুত্র দুলাল খ্যাপা মা'র আশ্রমের তান্ত্রিক বাগদি বুড়ার সান্নিধ্যে কৈশোর থেকেই অকুতোভয়, অবিনয়ী ও উদ্ধত। *আরোগ্য নিকেতনের* রংলাল ডাক্তারের আচরণ শবসাধকের মতো। কবর ও নদী থেকে মৃতদেহ উঠিয়ে এনে ময়ূরাক্ষী তীরের নির্জন বাংলোয় চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করেন তিনি। বামাচারীর মতো আচার বিচারহীন, রূঢ় নিষ্ঠুর সঙ্গী তাঁর খেয়াঘাটের মনা হাড়ি – শ্মশানবাসীর মতো ঘৃণা–ভয়-বিবমিষাশূন্য। মূলত 'বাঁকুড়া বীরভূমের মহাযান বজ্রযান সক্রিয় থাকায় বৈষ্ণব সহজিয়া ও তান্ত্রিক শাক্তধর্মের প্রসার হয় (মুখোপাধ্যায় ৩২৩)।'

তারাশঙ্করের পারিপার্শ্বিক ভূগোল ও তার সংলগ্ন মানুষের প্রতিফলন শাক্ত ভাবের গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। রাঢ়ভূমির বিচিত্র লোকায়ত জীবনের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শক্তি উপাসক ও উপাসনার প্রসঙ্গ তাঁর গল্পকে বাস্তবগন্ধী করে তুলেছে। তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনার বাস্তবচিত্র তাঁর গল্পগুলোকে উচ্চ মাত্রায় উন্নীত করেছে।

তথ্যসূত্র

গিরি, সত্যবতী। *তারাশঙ্করের কথাশিল্পে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব*। *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সম্পাদনা– ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ১৯৯৯।

দাশগুপ্ত, শ্রী শশিভূষণ। *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য*। সাহিত্য সংসদ, ১৩৮৭।

দেবতা, ধাত্রী। *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড) । মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৬।

বিশ্বাস, মিল্টন। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*। বাংলা একাডেমি, ২০০৯।

ভট্টাচার্য, জগদীশ। *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (১ম খণ্ড) । ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, জগদীশ। *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (২য় খণ্ড) । ১৯৯৮।

ভট্টাচার্য, জগদীশ। *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (৩য় খণ্ড)* । ১৯৯৭।

মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার। *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*। নবার্ক, ১৯৮৭।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বীরভূম বিবরণ* (২য় খণ্ড) । ১৩২৬।

সামাদী, সফিকুন্নবী। *তারাশঙ্করের ছোটগল্প : জীবনের শিল্পিত সত্য*। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪।